বাতি ঘর

পঞ্চম

ইফফাত আরেফীন

সব কিছু আচ্ছন্ন করে রেখেছে সকালের খাবার টেবিল। কোন অর্ণব সত্যি? যার সঙ্গে আট বছর সংসার করেছে সে, নাকি সকালে নাস্তার টেবিলে অতি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সেদ্ধ ডিমে বিট লবণ লাগাতে লাগাতে বসে খাওয়া কথার অর্ণব! ঠিক এই ভাবে ভাবতে পারা অথবা এই ভাষা! তনুকার বোধগম্য অর্ণব তো কেবল বোঝে ব্যবসা এবং মাঝে মাঝে বউ মেয়েকে নিয়ে ঘুরতে বের হওয়া অথবা কালে ভদ্রে মঞ্চ নাটক দেখা সেও বউকে খুশি করতে। আশ্চর্য, আটটা বছর পাশাপাশি ঘুমিয়ে একটুও বুঝতে পারেনি। অথচ তনুকা সম্পর্কে অবলীলায় বলতে পারাটা কি ভীষণ আশ্চর্যের। তনুকার কথাগুলোই কি ফিরিয়ে দিলো? হাসতে হাসতে একদিন তনুকা বলেছিলো কোথায় যেন পড়েছিলাম 'দাম্পত্য মানে একে অপরকে সহ্য করে যাবার খেলা'। সেটুকুও অর্ণব ধারণ করে রেখেছে এই মোক্ষম সময়ের জন্য!

তনুকা জানে সে দ্বিচারিনি, সে তো সবাই মনে মনে। বিয়ে মানে সহ্য করে যাবার খেলা বলেই অর্ণবকে সে বিয়ে করেছিলো। এমনকি শরীর শরীর খেলাতেও তার ভূমিকা ছিলো বেশ নিস্প্রভ। বিয়ের কিছুদিন বাদে কোনো এক রাতে রতিক্লান্ত শরীরে তনুকা অর্ণবের পাশে শুয়ে একটা ঘটনা বলেছিলো, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তনুকার হল রুমের দেয়ালে দেখেছিলো রমণরত দুই টিকটিকি, অল্প সময় পরে রতিক্লান্ত দু'জন পাশাপাশি পড়ে ছিলো।' বলার পর তনুকা জিজ্ঞেস করেছিলো বলতো আমাদের আর ওদের তফাৎ কি? অর্ণবের সরল উত্তর ছিলো 'টিকটিকির রক্ত সাদা আর আমাদের লাল। তনুকা মনে মনে জানে আদতে কোনো তফাৎ নেই ওটুকু ছাড়া।

সকালে অর্ণব কি অদ্ভুত ভাবে বলে গেল তনুকা আট বছরের সংসারে তোমার প্রতিটা কথা আমার মনে আছে। টিকটিকির গল্পটাও! কথাগুলো বলার সময় অর্ণবকে কি ভীষণ স্থির সৌম্যকান্তিময় দেখাচ্ছিলো! ঠোঁটের কোনে একটু হাসি কি লেগেছিলো?

কালো জমিনের শাড়ি অথবা চুড়িদার তনুকার শরীর ছোঁয় না কেন না কালোতে ভীষণ অরুচি অর্ণবের। আট বছর তনুকা দু'চামচের বেশি বা কম চিনি অর্ণবের চায়ে দেয়নি। ডালে পাঁচ ফোড়ন অর্ণবের ভীষণ পছন্দ তনুকা তা ভুল করে না।

হঠাৎ বুঝতে পারে তার চোখে জল, ভাবতে চায় পেঁয়াজ কাটার ফল। কিন্তু সে তো বুয়ার কাজ ফ্রাইপ্যান এ সবজি বাগার দিতে দিতে চোখ মুছে ফেলে। অর্ণবের কথাটাই জাবর কাটে নিজেকে কেন ঠকাচ্ছ তনুকা? আরও যেন কি বলেছে অর্ণব? মাথার ভেতর হাতড়ে ফেরে হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ে যায়। 'প্রতিটি রাতে যতবার তোমাকে ছুঁয়েছি ততবার তুমি কেঁপে উঠেছো, শিউরে উঠেছো যেন অন্য পুরুষ তোমাকে স্পর্শ করেছে। তোমার মধ্যে আমি কোনো দিন প্রশান্তি দেখিনি। তোমাকে নিয়ে যতবার ঘরের বাইরে গিয়েছি দেখেছি তুমি কাকে যেন খোঁজ। আমি তোমার পুরুষ হতে পারিনি পরপুরুষ রয়ে গেছি।'

গত আট বছর তনুকা কোনো বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি। তার সমস্ত আবেগ অনুভূতি সে বন্দী করে রেখেছে তালপুকুরের সিন্দুকের চৌদ্দটা বাক্সের শেষ বাক্সে। কিভাবে ধরা পড়ে গেল তনুকা?

অর্দ্রির ডাকে ঘোর ভাঙে। আশ্চর্য কখন এলো মেয়েটা টের পাইনি কেন?

: মা জানো বুবুনটা স্কুলের গোলাপ ফুলের কুঁড়ি খেয়ে ফেলেছে। ওর নাকি মিষ্টি লাগে বাংলার মিস বলেছে ও নাকি বড় হয়ে পাকিস্তানি মুরগি হবে। কি অদ্ভুত না বুবুন বড় হয়ে মুরগি হয়ে যাবে।

তনুকা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, আশ্চর্য অর্দ্রি কবে থেকে অদ্ভুতকে ওদ্ভুত বলে? তনুকা চেয়েছিলো হিমাদ্রিকে আজ কিছুতেই ডাকবে না। হিমাদ্রি বলতো ওদ্ভুত। রিকশাতে ঘুরতে ঘুরতে বলতো দেখেন তনুকা আপা মেঘগুলোকি ওদ্ভুত। মেঘগুলো গলে গলে কি ওদ্ভুত আলো এসে পড়েছে পাতাগুলোতে। ওই পাতাগুলোর কাছে আলোটা খুব খুব মূল্যবান তা জানেন? আমার কাছে আপনি ঠিক ওরকম!

মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে ভড়কে যায় অর্দ্রি। ছয় বছরের জীবনে এই প্রথম কোনো বয়স্ক মানুষের চোখে জল দেখেছে সে, মা কাদছো? কেউ বকা দিয়েছে? বাবা? খুব ওন্যায় করেছে। তনুকা এবার স্তম্ভিত হয় আশ্চর্য! আশ্চর্য!

মনে পড়ে অর্ণবের কথা 'তনুকা আমাদের এই সংসার সংসার নামক হিপোক্রেসি যদি অর্দ্রি কখনও ধরতে পারে ওর অবস্থা কি হবে ভাবতে পারো? আমাদের ফাঁকটুকু নিয়ে ও বেড়ে উঠুক সেটা কি ভালো। আমি মনোগমাস তাই ভীষণ মানোগমাস থাকতে চাই। কিন্তু সমস্যা কি জানো? আমি সেটা বুঝি আর বুঝি বলেই ভয় হয়।'

আমি তোমাকে ঠকাতে চাই না।

কিন্তু তনুকা কিভাবে মুছে ফেলবে সেই সব দিন, সুজলপুর, ছুটিপুর, সুতনুকানদী, আর ছাদে লুব্ধক তারা নিচে সেই চুম্বন। তারপর সেই মুক্তেশ্বরী নদী হিমাদ্রি যার নাম দিয়েছিলো মৌমিতা। তনুকা তো জানে তাকে যেতে হবে মেঘের কাছে। মেঘ ফিরবে, হিমাদ্রির আর কোনো জায়গা নেই।

কিন্তু অর্ণবের অবাক চোখ ভুলতে পারছে না তনুকা খানিকটা ভেজা অথচ কি দৃঢ় স্বরে অর্ণব বলল, তনুকা আমি অবাক হয়ে যাই তোমাকে দেখে কতোটা নিপুণ ভাবে ঘরকন্যা করো তুমি অথচ ঠিক কতোটা ভেতর থেকে কর না। তুমি কে তনুকা? কোনটা সত্যি? অর্দ্রির জন্মের আগে থেকে এই প্রশ্নগুলো ঘুরছে মাথায় আমি আর পারছি না, মনে পড়ে তোমার? মৃত্তিকা যখন প্রথম মা হলো আমরা দেখতে গেলাম তুমি বললে 'মৃত্তিকার চোখে আলো দেখছো? মা হলে বোধ হয় এমন হয়, ভালোবাসার কি আশ্চর্য সৃষ্টি না?' তনুকা তোমার চোখে আমি সে আলো খুঁজেছিলাম পাইনি।

আলোর উৎস যে নেই অর্ণব, আমার সমস্ত আলো হিমাদ্রি নিয়ে গেছে, তোমার আলোতে মেশেনি আমার আলো। খুব ক্ষীণ একটা রেখা টিম টিম করছে, তাতে কাজ চলে বটে কিন্তু স্বস্তি হয় না।

হিমাদ্রি বলতো আপনি হলেন নদী, সুতনুকা নদী। অথচ সেই ছোট্ট বুকে কি আঘাত করেছে। হিমাদ্রি চলে গেছে ফুলের কাছে যাবার আগে চিঠিতে লিখেছিলো—

'যে নদীটি চলে গেছে শহরের বুক চিরে রূপকথার মতন
তার হৃদয়ে কাছে গিয়ে হাঁটুমুড়ে আর কখনই বলব না
ব্যথা পেয়েছি ভীষণ'

কিন্তু হিমাদ্রি বলেছিলো ফিরবো সত্যি ফিরবো হয়তো দেখা হবে মায়া সভ্যতায়।

সকালে অর্ণবের শেষ কথাগুলো বলেছিলো বড্ড কাতর গলায় ভালোবাসাহীন সম্পর্কে কি লাভ তনুকা? তোমাকে ধরে রাখার সাধ্য আমার নেই। গত আটটি বছর আমি চেষ্টা করেছি। আমি ক্লান্ত।

অভিমানে অভিমানে ক্লান্ত হিমাদ্রিও একদিন বলেছিলো-

কোনো অভিযোগ নেই অভিমান নেই, শুভ বিদায় প্রাণেরশ্বরী।

বারান্দায় বিকেল পড়ে এসেছে। দুপুরে অর্ণবের না খেতে আসা অথবা অর্দ্রির না ঘুমানো নিয়ে তনুকা কোনো অভিযোগ করেনি। বারান্দার রকিং চেয়ারে চোখ বন্ধ করে বসে আসে। চেয়ারটা আপনা আপনি দুলে যাচ্ছে।

তনুকার চোখের সামনে কতশত দৃশ্য চলে যাচ্ছে প্যানারোমার মতো। অর্দ্রি টেনে টেনে কি যেন গুনছে, বোধ হয় রেলিংয়ে বসা পাখিগুলো।

ও-য়া-ন সুজনপুর রিকশাতে ঘোরা টু-উ-উ দুটি পুরের দেবদারুবন থ্রী-ই-ই মেলায় হাত ধরে ঘোরা ফো-ও-র মৌমিতা নদী সি-ক-স এই নদীর নাম সুতনুকা সে-ভে-ন দেখা হবে মায়া সভ্যতায় এ-ই-ট অর্ণবের সঙ্গে বিয়ে না-ই-ন আজ সারা দিন টে-এ-ন হিমাদ্রি ভেদ করে অর্দ্রিনামক বাতিঘরের হাতছানি।

ধাপ্পা

ষষ্ঠ

কামরুল হাসান শিবলী

'আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনার কোনো সমস্যা নেই। তাহলে আমার কাছে কেন এসেছেন।' প্রায় খেকিয়ে উঠলেন নীরেন্দ্রনাথ বৈশাখী।

সারোয়ার সাহেব অস্বস্তিতে পড়লেন, অস্বস্তি এড়াতে তিনি হাতঘড়ির দিকে তাকালেন, রোলেক্স কোম্পানির ঘড়ি। যার হাতে এ ধরনের ঘড়ি সে সাধারণ জ্যোতিষীর কাছে হাত দেখাতে আসে না। এমন না যে তিনি প্রেমে ব্যর্থ হয়েছেন। বিয়ে করে বাচ্চা-কাচ্চা হলে অযথা টাকা-পয়সা নষ্ট হবে চিন্তা করে তিনি বিয়েই করেননি। তারপরও যে এমন অজপাড়াগাঁয়ে জ্যোতিষীর কাছে এলেন তার কারণ মূলত সাইনবোর্ড, বিশাল অর্জুন গাছে লেখা—

Philips Lighting
PHILIPS
PHILIPS

রাজ জ্যোতিষী নীরেন্দ্রনাথ বৈশাখী
উপমহাদেশের মধ্যে প্রথম
দু'বার রৌপ্য পদকপ্রাপ্ত।

আরও কি যেন লেখা ছিল কিন্তু রং উঠে যাওয়ায় তা পড়তে পারলেন না। তিনি আগ্রহী হয়েছেন শেষ লাইন দেখে, সাধারণত মানুষ স্বর্ণপদক পায়। রুপার পদকের কথা এমন ফলাও করে কেউ প্রচার করে না, তারপও ঢুকতেন না কিন্তু কৌতূহল মেটাতেই ভেতরে ঢুকে এমন অস্বস্তিতে পড়া, নীরেন্দ্রনাথ বৈশাখীর বয়স সত্তর কি পঁচাত্তর হবে, সে তুলনায় শরীর শক্ত সামর্থ্য, চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গিয়েছে। চুল অস্বাভাবিক সাদা, মনে হয় গল্পের বইয়ের কোনো প্রেত উঠে এসে কলাকান্দি গ্রামে আসর বসিয়েছে।

নীরেন বাবু এবার নিজে থেকেই বললেন, আপনার জন্ম তৃতীয় তিথিতে, শনিবার রাত এগারোটায়। বাইশে চৈত্রতে, কি ঠিক বললাম।'

সারোয়ার সাহেব দারুণ আশ্চর্য হলেন, বাংলা সন তিনি জানেন না। কিন্তু তার জন্ম আসলেই ঐ সময়, তিনি বেশ চাপা স্বরে বললেন, আপনি তো বেশ ভালোই জানেন, তাহলে এ অবস্থা কেন বলুন তো।

আরে বাবা রাজ-রাজাদের বিদ্যা এ এলাকায় কে বুঝবে, আমার পিতামহ উমাচরণ বৈরাগী তিব্বতের রাজ জ্যোতিষী ছিলেন, তার মূর্তি নাকি এখনও সেখানে আছে। পয়সার অভাবে যেতে পারছি না সে জায়গায়। আফসোস, তা বাবা হাত কি আসলেই দেখাবেন। আপনার লক্ষ্মীতে তো শনির কোনো ছায়াই দেখছি না।

তিনি কোনো কথা না বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন টেবিলের ওপর, বললেন, আমার আয়ুরেখাটা একটু দেখুন তো, আর কতোদিন বাঁচবো।

সারোয়ার সাহেব আশা করেছিলেন যে, নীরেন্দ্রনাথ বাবুর কাছে অন্তত একটা আতশী কাঁচ হলেও থাকবে। কিন্তু জ্যোতিষী বাবু সরাসরি তার ডান হাতকে মেলে ধরলেন চোখের সামনে। আস্তে আস্তে বললেন, আপনার শরীরে অনেক দিন ধরেই রাজ রোগ বাসা বাঁধছে।

তিনি একটু চমকালেন, তার রক্তে হাই কোলেস্টরেল, যে কোনো সময় হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। নীরুবাবু কি সেদিকেই ইঙ্গিত করছে নাকি তা বুঝলেন না। কিন্তু জ্যোতিষীর পরের কথা শুনে তার মাথায় অল্প যে কিছু চুল ছিল তা খাড়া হওয়ার দশা হলো।

আপনার আয়ুরেখা মঙ্গলের দিকে অত্যন্ত সংকীর্ণ রূপ পরিগ্রহ করছে। আপনার মৃত্যু তারিখ কি বলে দেবো?

সারোয়ার সাহেব কি বলবেন বুঝে ওঠার আগেই তিনি বললেন– মৃত্যু হবে আপনার আগামী মঙ্গলবার রাত্রি দ্বিপ্রহরে।

তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন, জ্যোতিষের ঘর থেকে বের হয়ে এলেন অত্যন্ত মন খারাপ করে। তিনি গুই সাপের ব্যবসা শুরু করতে চাচ্ছিলেন, সে জন্যই এখানে আসা। এখন মনে হচ্ছে সব কিছু উঠিয়ে নেয়ার সময় হয়েছে। জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস তার হচ্ছে আবার হচ্ছেও না। তিনি সারা জীবন গাধার মতো কষ্ট করেছেন। অবশ্য গাধা কি রকম কষ্ট করে তিনি তা কখনও দেখেননি কিন্তু আন্দাজ করতে পেরেছেন। একটা পাই-পয়সাও বাজে খরচ করেননি। ব্যবসায়ী মহলে তিনি পরিচিত শাইলক বলে। যার ফলেই তার ব্যবসা আজ ফুলেফেঁপে দেশ ছেড়ে বিদেশেও পাড়ি জমিয়েছে। ঢাকায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে তিনি ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবলেন, মনকে বুঝ দিলেন যে জ্যোতিষশাস্ত্র পুরোই ভ্রান্ত। কিন্তু ঢাকায় পৌঁছেই তিনি ডাকলেন তার ম্যানেজার আসগর আলীকে। বললেন, আসগর সাহেব, দেখুন তো আমাদের কোম্পানির টোটাল এসেট কতো। লায়াবিলিটিস বাদ দিয়ে হিসাব করে আমাকে ঘন্টাখানেকের মধ্যে জানান।'

ম্যানেজার চলে যেতেই তিনি আবার ভাবনায় পড়লেন, সারা জীবন কোনো দান-খয়রাত করেননি। মঙ্গলবার যদি আসলেই মরতে হয় তাহলে কিছু দান-খয়রাত করাই ভালো। এই প্রথম তার মধ্যে মৃত্যুভয় ঢুকলো, একবার ভাবলেন এখনই মৌলানা ডেকে তওবা করবেন। আরেকবার ভাবলেন, না থাক, সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর তওবা করবেন।

আকাশে মেঘ করেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তিনি জানালা ধরে দাঁড়ালেন, তার আজীবন সঞ্চয় কোনো কাজে লাগাতে হবে। এমন কোনো কাজ যেন ভবিষ্যতে সবাই উপকৃত হয়।

দরজা ঠেলে তার ম্যানেজার প্রবেশ করলো। স্যার, লায়াবিলিটিস বাদে টোটাল এসেট আমাদের প্রায় তিরাশি কোটি টাকা, একচুয়াল পরিমাণটা সন্ধ্যার আগে বলা যাবে।'

তিনি চমকে উঠলেন, তিনি কল্পনাই করেননি টাকার পরিমাণ এতো হবে। এই গাধারা নিশ্চয়ই কোনো ভুল করেছে। এখন কোনো ভুল হওয়া চলবে না। কোনো পরিকল্পনায় হাত দেওয়ার পর যদি দেখা যায় টাকায় কুলোচ্ছে না, তাহলে বেইজ্জতির একশেষ। শেষ সময়ে এসে এ ধরনের কোনো ঝামেলা যোগ করা যাবে না।

বিকেলে যখন তিনি অফিস থেকে বেরোচ্ছেন তখন আবার ম্যানেজার রুমে ঢুকলো। বেচারার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে বোঝাই যাচ্ছে। স্যার, আসলেই হিসাব ভুল ছিল। গতকাল সকালে আমরা আট কোটি টাকার একটা বিল পেয়েছি। আমাদের এসেট এখন একানব্বই কোটি টাকার কিছু কম।

বাড়িতে পৌঁছে তিনি বুঝলেন আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা চলবে না। তিনি পাকা ব্যবসায়ী। স্বপ্ন কিভাবে পূরণ করতে হবে তা তিনি ভালোই জানেন, তিনি চিন্তা করতে লাগলেন তার প্রতিষ্ঠান কিভাবে কাজে লাগানো যায়। এই প্রথম কোনো পরিকল্পনা করতে গিয়ে তার মনে উত্তেজনা এলো।

রবিবার দিন সকালে তার শরীর বেশ খারাপ করলো। দু'টুকরো পেঁপে খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বমি করে দিলেন। কিন্তু তার মনে চিন্তার কোনো ছাপ দেখা গেল না। তিনি তার অর্থ-বিত্তের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। ভালোভাবেই করতে পেরেছেন। তার মা ছিলেন অশিক্ষিত। তিনি প্রথমেই একটা বড় অংশ নারী শিক্ষায় ব্যয় করলেন। তার গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার মনে হলো ভিরমি খেয়েছেন। ভিরমি খাবার কারণও অবশ্য আছে। ছ'মাস আগেও তিনি (মাস্টার সাহেব) যখন তার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছিলেন তখন তাকে ধমকে বিদায় করেছিলেন।

তিনি ছোটবেলাতেই হারিয়েছেন মাকে। বাবা-মায়ের মৃত্যুর দু'একদিন পরেই অন্যত্র বিয়ে করলেন। তিনি সংসারে কাঁটা হয়ে থাকেননি। তাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো এতিমখানায়, অনাথাশ্রমের জীবন যে কি যন্ত্রণার তা তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন। তাই তিনি তার ব্যবসার লাভ পুরোটাই দিয়ে দিলেন তার গ্রামের অনাথাশ্রমে। একদিনেই সে আশ্রমের চেহারা নাকি একদম পাল্টে গেছে। লোকমুখে কানাঘুষা চলছে তিনি নির্বাচনে দাঁড়াবেন, এটা শুনে খানিকক্ষণ আপন মনে হাসলেন। সন্ধ্যাবেলা তওবা করলেন। মৌলানাকে আগেই খবর দেয়া ছিল। তিনি নীরবেই যাবতীয় কাজ সেরে রওনা হলেন তার গ্রামের দিকে।

সোমবার রাতে তার শরীর আরও খারাপ হলো। তিনি অবিবাহিত মানুষ। তাছাড়া অফিসের কেউই জানে না, তিনি মরতে বসেছেন। বললেও জ্যোতিষীর কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। খামাখা হাসাহাসি করবে। এই হাসি-ঠাট্টা জিনিসটা তিনি একদম সহ্য করেন না। তিনি নিভৃতে অপেক্ষা করতে থাকেন শেষ সময়ের জন্য। তার টাকায় করা অনাথাশ্রমের পাশেই ছোট্ট কটেজ। শেষ সময়ে তিনি কৈশোরের পরিচিত জায়গাকেই বেছে নিয়েছেন। জায়গাটাই শুধু পরিচিত, কারণ অনাথদের মুখে আগের সেই ক্লান্তির ছাপ নেই, এখন দেখলে মনে হয় অনাথ হওয়াতেই এরা খুশি। সারোয়ার সাহেব তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেই ঢলে পড়লেন বিছানায়।

পরিশিষ্ট : অনাথাশ্রমের নতুন নিয়ম হয়েছে শিশুদের সকাল সাতটায় দুধ, ডিম, মাখন খেতে হবে। বাচ্চাদের এতো সকালে ঘুম ভাঙানো আরেক যন্ত্রণা। অনাথাশ্রমের পরিচালক তাই বিশাল এক ঘন্টা বাজিয়ে তাদের জড়ো করেন। ঘন্টার শব্দ এমনই প্রকট যে, আশপাশের সবার কানের তালা ফেটে যায়, মঙ্গলবার সকালে সে শব্দেই সারোয়ার সাহেব জেগে উঠলেন। প্রথম খানিকক্ষণ তিনি কিছুই বুঝলেন না। হঠাৎই বুঝতে পারলেন তিনি আসলে মরেননি, তার মেজাজ প্রচন্ড খারাপ হলো, আবার এও বুঝলেন বেঁচে থাকার জন্য মেজাজ খারাপ হওয়া খারাপ দেখায়। কিন্তু ধাপ্পাবাজ জ্যোতিষীর কথা মনে হতেই তার হাত চলে গেল মোবাইলে। ঢাকার ব্রাঞ্চ অফিসের ম্যানেজারকে বললেন, নীরেন্দ্রনাথ বৈশাখী নামের লোককে খুঁজে বের করতে। ম্যানেজার করিৎকর্মা লোক, সে বলেছে, দু'দিনের বেশি নাকি লাগবে না।

তিনি বারান্দার যে অংশ রৌদ্রোজ্জ্বল, সেখানে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন। শত শত ছেলে ছুটে যাচ্ছে খাবার হাতে নিয়ে। অত্যন্ত দুষ্টু এসব ছেলে, ঘরে কেউ খাবার খায় না। সবাই সকালের নাস্তা ছোট্ট দু'হাতে নিয়ে মাঠে চলে আসে। তিনি তাকিয়ে দেখেন দৌড়াদৌড়ির মাঝেই কে একজন ইচ্ছা করে পাশের জনকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছে। সেই ছেলে উল্টে পড়েছে কিন্তু হাত থেকে রুটি-মাখনের প্যাকেট ছুটে যায়নি। আর সবচে' অদ্ভুত ব্যাপার, সবার সঙ্গে সঙ্গে সে দু'জনও হাসছে।

এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো নীরেন্দ্রনাথ বৈশাখী তার কৈশোরকে সামান্য সময়ের জন্য হলেও ফিরিয়ে দিয়েছেন। গভীর আনন্দে তার মন আপ্লুত হলো। তিনি আবার ফোন হাতে তুলে নিলেন। বলে দেবেন– থাক, জ্যোতিষীকে খোঁজার কোনো দরকার নেই।

Philips Lighting
PHILIPS